সমকাল

29 February, 2012 Page: X-6

শিশুদের পূর্ণাঙ্গ মেধা বিকাশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ

তার বয়সের অনেক মেয়ের মতো বাল্য বয়সেই হোসনে আরা ফরিদের বিয়ে হয়ে যায়। সবেমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেছিলেন। তার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ১৪ ভাইবোনের বড় পরিবারে বাবার সিদ্ধান্ত তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। বাল্যবিবাহের চরম বাস্তবতা তার লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার অদম্য সংকল্পকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। হোসনে আরা খুবই ভাগ্যবতী যে তার স্বামী লেখাপড়ার প্রতি তার আগ্রহকে উৎসাহিত করতেন। এর ফলে তিনি বিয়ের পর আবার লেখাপড়া শুরু করতে পেরেছিলেন। এভাবে তার জীবনের নতুন পথচলা শুরু হয়।

সরকারি চাকুরে স্বামীর চাকরির সুবাদে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াতে হতো। বারবার স্বামীর কর্মস্থল পরিবর্তনের মধ্যেও তিনি কুমিল্লা মহিলা কলেজ থেকে স্নাতক এবং ময়মনসিংহ কলেজ থেকে বিএড ডিগ্রি অর্জন করেন। লেখাপড়া সম্পন্নের পর শিক্ষকতা পেশার প্রতি প্রচণ্ড টান অনুভব করেন। ঢাকা টিঅ্যান্ডটি সরকারি স্কুলে শিক্ষকতায় নিয়োজিত তার ছোট বোন তাকে আরও অনুপ্রাণিত করেন। ১৯৮০ সালে সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলে তিনি তার শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। পরে তিনি আরও কয়েকটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তখন তিনি অনুভব করেন, কোমলমতি ছেলেমেয়েদের প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের আরও যত্নবান হওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদের আরও স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা তাদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এতে তাদের মেধা ও মননশীলতা বিকাশ পাবে। তখন থেকে তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন যে, একদিন তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন, যেখানে কোমলমতি শিশুদের পরিপূর্ণ মেধা বিকাশে যত্ন সহকারে পাঠদান করা হবে। স্কুলটি হবে একটি বিদ্যা-উদ্যান, যেখানে কোমলমতি শিশুরা ফুল হয়ে প্রস্ফুটিত হবে। বিকশিত হবে তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা। পারিবারিক দায়িত্ব ও আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি স্বপ্নের স্কুলটিকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছিলেন না। ১৯৮৪ সালে যখন তার ছেলেমেয়েরা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে তখন তিনি মনে করেন স্কুল চালু করার জন্য এটিই মোক্ষম সময়। একদিন তার মহল্লার একটি বাসায় বাড়ি-ভাড়া সাইনবোর্ড দেখে তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন এটি শুধু একটি সাইনবোর্ড নয়, বরং তার লালিত স্বপ্ন পূরণের সংকেত। কোনো সময় নষ্ট না করে তিনি ৬ হাজার টাকায় বাসাটি ভাড়া নেন। মাত্র ৩৬ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে এই বাসায় তার স্বপ্নের স্কুলটি চালু করেন। তিনি স্কুলটির নাম দেন 'পারিজাত শিক্ষাঙ্গন', যার অর্থ স্বর্গীয় ফুল। শিশুদেরও তিনি স্বর্গীয় ফুল মনে করেন। 'প্রতিটি শিশুই আলাদা ও স্বকীয় গুণের অধিকারী। তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশেষায়িত যত্ন ও পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ প্রয়োজন। শিশুদের জন্য লেখাপড়া হতে হবে আনন্দদায়ক, বোঝাস্বরূপ নয়। ছেলেবেলার স্কুলের শিক্ষা শিশুদের বিকশিত ভবিষ্যতের ভিত রচনা করে। এই মূলমন্ত্র ধারণ করে আমি আমার স্কুল পরিচালনা করি।' স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি এভাবেই বর্ণনা করেন হোসনে আরা। ২৩ জন ছাত্রছাত্রী ও তিনজন শিক্ষক নিয়ে তিনি তার ছোট্ট স্কুলের যাত্রা শুরু করেন। ২৭ বছর পর তিনি আজ ঢাকায় পাঁচটি স্কুল পরিচালনা করছেন। বিশেষায়িত যত্ন ও পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়ায় অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের এই স্কুলে নিয়ে আসেন। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তিসহ অন্যান্য পাঠ্যবহির্ভূত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করা হয়, যা শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। অভিভাবকদের ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় স্কুলের শাখা খোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর জন্য তার আর্থিক সমর্থন প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায় দেশের সবচেয়ে বড় এসএমই ব্যাংক 'ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড'। এই স্বপ্নময়ী ও সংগ্রামী নারী উদ্যোক্তাকে ২০০৯ সালে পাঁচ লাখ টাকা ও ২০১১ সালে ১০ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদান করে ব্র্যাক ব্যাংক। এর মাধ্যমে তিনি ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় স্কুলের বেশ কয়েকটি শাখা চালু করেন। ব্যাংকিং সুবিধার বাইরে থাকা অপ্রচলিত বিভিন্ন খাতে ঋণ সুবিধা প্রদান করে ব্র্যাক ব্যাংকের এসএমই ব্যাংকিং বিভাগ, যা সমাজের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বৃহৎ করপোরেট অর্থায়নের তুলনায় শিক্ষা খাতের এই উদ্যোক্তাকে প্রদানকৃত ঋণের পরিমাণ সংখ্যার হিসাবে অতি ক্ষুদ্র হলেও এটি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে লক্ষণীয় অবদান রেখেছে। শিক্ষা খাতের এই উদ্যোগ ব্র্যাক ব্যাংকের অন্যতম মিশন 'আলোকিত সমাজ গঠন'-এর সঙ্গে মিলে যায়। এই সাফল্যের পর তিনি তার জন্মস্থান কিশোরগঞ্জে 'পারিজাত শিক্ষাঙ্গন'-এর একটি শাখা এবং একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা এখানে বিনা খরচে লেখাপড়া করতে পারে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি এ দুটি প্রতিষ্ঠান চালু করেছেন। তার এতসব উদ্যোগে মূল অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন তার স্বামী। তিনি আজ নেই। কিন্তু তার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ এখনও রয়ে গেছে। তিনি আশা করেন, তার দুই মেয়ে ও একমাত্র ছেলে তার এই স্বপ্নের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মানসম্পন্ন শিক্ষা পেতে পারে।